"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্তি তাহা সত্য, আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝি। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি ভাবে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

কবি-জীবনী

কপোতাক্ষ নদের তীরস্থ যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের (মতান্তরে ১৮২৩) ২৫শে জানুয়ারী শনিবারে এক সঙ্গতিপন্ন কায়স্থ-পরিবারে কবিবর মাইকেল মধুসূদনের জন্ম হয়। তিনি শ্রীমধুসূদন হইয়াই জন্মিয়াছিলেন, মাইকেল হইয়া নহে। ইঁহার পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্রের দুইটি বিশিষ্ট গুণ পরিস্ফুটভাবে আত্মপ্রকাশ করে—প্রথমতঃ অধ্যয়নস্পৃহা, দ্বিতীয়তঃ কাব্যপ্রীতি। লেখাপড়ায় ইনি ছিলেন পরম উৎসাহী, অনলসভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। কি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায়, কি যৌবনে হিন্দু কলেজে অথবা বিশপস্ কলেজে অধ্যয়ন-কালে, কখনো পড়াশুনায় কাহারও পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, মধুসূদন ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহা ভিন্ন, অতি শৈশবেই তিনি তাঁহার মায়ের নিকট হইতে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শুনিতেন; আর উহা শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। এই রামায়ণ-মহাভারত মধুসূদনের কবিজীবনের ভিত্তিস্বরূপ ছিল, তাই যাবজ্জীবন ইহারা ছিল তাঁহার আদরের বস্তু। বলা বাহুল্য, উত্তরকালে এই দুই অমূল্য গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃতিদত্ত অসামান্য কবিত্বশক্তি-বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। বালকবয়সে আগমনী ও বিজয়ার গান শুনিয়াও মধুসূদনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাল্যকালেই কবির অন্তর অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হইয়া উঠে।

গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া মধুসূদন নয় বৎসর বয়সে কলিকাতায় হিন্দু কলেজের জুনিয়র স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন। এইখানেই তিনি সহাধ্যায়ীরূপে পান বাংলার অন্যতম মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে। জুনিয়র স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া মধুসূদন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে প্রবেশ করেন। মধুসূদন যখন ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র, সেই সময় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তাঁহার বন্ধু ও সহপাঠী ভূদেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক লাভ করেন। মধুসূদন হিন্দু কলেজের মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় তিনি বহু ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। এই সময়েই তাঁহার কবিত্বশক্তির উন্মেষ। মহাকবি হইবার ও বিলাত যাইবার ইচ্ছা হিন্দু কলেজে পঠদ্দশাতেই তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। এই সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহু গ্রন্থ পাঠ করেন এবং তাঁহার রচিত কোনো কোনো ইংরেজি কবিতা বিলাতের মাসিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতে সাহসী হন।

হিন্দু কলেজে পড়িবার সময়ে দুইজন ইংরেজ অধ্যাপকের প্রভাব তাঁহার চরিত্রে সুপ্রকট হইতে দেখা যায়; ইঁহাদের নাম ডিরোজিও ও রিচার্ডসন। মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, সে সময় যদিও ডিরোজিও সাহেব কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা মধুসূদন অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। ডিরোজিও তাঁহার ছাত্রদিগকে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সকল বিষয়েরই দোষ-গুণ আলোচনা করিয়া নিজেদের কর্তব্যপথ নির্ণয় করিতে শিক্ষা দেন। মধুসূদন প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হইলেও, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছিল। রিচার্ডসন্‌ও ডিরোজিওর ন্যায় কবির আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক রিচার্ডসন্ ছিলেন কবির কল্পনা-জগতের পথপ্রদর্শক। মধুসূদনের নিকট এই রিচার্ডসন্ এত প্রিয় ছিলেন যে, মধুসূদন তাঁহার গুণগুলির অনুকরণ ত করিতেনই, এমন কি তাঁহার দোষগুলিও অনুকরণ করিতে ভালবাসিতেন। রিচার্ডসনের প্রভাবের মূল কথাই হইল আত্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন। সুতরাং বালকবয়সে প্রকৃতির লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে লালিত-পালিত হইয়া এবং রামায়ণ-মহাভারত পাঠ করিয়া মধুসূদনের অন্তরে যে কবিত্বশক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, রিচার্ডসনের শিক্ষায়, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় তাহা যে উদ্ভিন্ন হইবার পথ খুঁজিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই রিচার্ডসনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই মধুসূদন কলেজে অধ্যয়নকালে কেবল ইংরেজিতেই কবিতা রচনা করিতে থাকেন।

আশ্চর্য এই যে, যিনি বঙ্গ সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক কবি বলিয়া আজ বিখ্যাত, তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে বঙ্গভাষার প্রতি একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। সেকালে অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তির মত তাঁহারও ধারণা ছিল যে, ইংরেজি ভাষায় গদ্য-পদ্য রচনা করিয়াই তিনি যশ ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন। যাহা হউক, পরে তাঁহার এই ভুল ভাঙিয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বিদেশী ভাষায় যতই অধিকার থাকুক না কেন, তাহার আশ্রয়ে কোন চিরস্থায়ী কবি-গৌরব অর্জন করা যায় না। ভুল ভাঙিবার পরে মধুসূদন বাঙলাভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন এবং বাঙলায় কাব্য, নাটক প্রভৃতি রচনা করিয়া অক্ষয় যশ অর্জন করিতে সক্ষম হন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে মধুসূদন বিজাতীয় ভাব ও আদর্শে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কবি হোমর, ভার্জিল, তাসো, মিলটনের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা এই সময় তাঁহাকে পাইয়া বসে। শুধু তাহাই নহে, বিলাত যাইবার আকাঙ্ক্ষাও এই সময় হইতে তাঁহার মনে বলবৎ হইয়া উঠে। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁহার স্নেহময় জনক-জননী, সাংসারিক সুখসম্পদ সমস্তই জন্মের মত বিসর্জন দিয়া হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন (১৮৪৩)। খৃষ্টান হইবার পর তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় মধুসূদনের হিন্দু কলেজে আর স্থান হইল না। হিন্দু সমাজেও নহে। অতঃপর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিশপস্ কলেজে ভর্তি হইতে হইল। এই ধর্মান্তরগ্রহণ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বিপর্যয়ের কারণ হইতে পারে, কিন্তু কবি-জীবনে বুঝি ইহারই মধ্যে ঘটে বৃহত্তর বিকাশের দ্বারোদ্ঘাটন।

হিন্দু কলেজের ন্যায় বিশপস্ কলেজও তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনকে গঠন করিতে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু কলেজে ঘটে ভাব-প্রবণতা, কবি-প্রতিভা ও রচনাশক্তির উন্মেষ, আর বিশপস্ কলেজ হয় তাঁহার ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র। ইংরেজি, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অভ্যন্তরে যে সৌন্দর্য বর্তমান, বাঙলাভাষায় কাব্যরচনা করিবার সময়ে উহা তিনি বাঙলা কাব্যে প্রবর্তিত করিতে প্রয়াসী হন। সুতরাং বিশপস্ কলেজে, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষাসমূহ শিক্ষা করিতে আরম্ভ না করিলে মধুসূদনের কাব্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সমাহৃত দেখিতে পাইতাম না। এই কলেজে তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিবারও সুযোগ পাইয়াছিলেন।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়া অচিরেই মধুসূদনের বিলাতগমনের সুবিধা হইল না। এমন কি বিশপস্ কলেজে থাকিয়া বেশীদিন পড়াশুনা করাও হইল না ; পিতা অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলেন। মাত্র তিন-চারি বৎসর বিশপস্ কলেজে অধ্যয়নের পর মধুসূদন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া অকস্মাৎ মাদ্রাজ চলিয়া গেলেন (১৮৪৮)। মাদ্রাজে মধুসূদনের প্রবাসজীবন দারুণ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যে পূর্ণ। এই স্থানে থাকিতে প্রথমে তিনি এক অনাথ-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেন। ক্রমে অবশ্য তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও মাদ্রাজের তদানীন্তন বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'Spectator'-এর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার দারিদ্র্য দূর হয় নাই। তাই দারিদ্র্যমোচনের জন্য এবং দারিদ্র্যদুঃখ ও নৈরাশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য তিনি মাদ্রাজে থাকিতেই নিজেকে সাহিত্যসেবায় নিয়োজিত করেন। এইরূপে প্রকৃতি তাঁহার মধ্যে প্রতিভার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি নিহিত রাখিয়াছিলেন, তাহা উদ্গত হইবার সুযোগ পাইল। তিনি মাদ্রাজের বহু সাময়িক পত্রিকায় ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজিতে 'Captive Lady', 'Visions of the Past' এই সময়ের রচনা (১৮৪৯)। 'ক্যাপটিভ লেডী' মধুসূদনকে মাদ্রাজের কৃতবিদ্য-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার সংবাদপত্র-মহলে ইহা তেমন আদৃত হয় নাই। বাঙালী পাঠকও ইহা তেমন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে নাই। বাঙলা হইতে তাঁহার অনুরাগী বন্ধুরা বার বার মধুসূদনকে মাতৃভাষা চর্চা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন—ইঁহাদের অনুরোধে তাঁহার মনের গতি ফিরিল ; অতঃপর তিনি মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসংকল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন।

মধুসূদনের এই সময় দৃঢ় ধারণা হইল যে, বাঙলাভাষাই তাঁহার কবিত্বস্ফুরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং যদি তিনি কোনো ভাষায় অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন তবে তাহা এই বাঙলাভাষাতেই। যে বাঙলাভাষার প্রতি এতদিন কবির বিরাগ ছিল, এইবার সেই বাঙলাভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ

জন্মিল। রামায়ণ-মহাভারত তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। অনুরাগের সহিত মাদ্রাজে বসিয়া তিনি উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতেন এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্যভাষার অনুশীলন করিয়া ঐ সকল পাশ্চাত্ত্যভাষার কাব্যকানন হইতে মনোহর ভাবকুসুম চয়ন করিয়া উহা দ্বারা বঙ্গবাণীর দেউল সাজাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

এইভাবে মনে মনে বাঙলাভাষার অনুশীলনে কৃতসংকল্প হইয়া এই ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগের উদ্দেশ্যে রিক্তহস্তে মাদ্রাজ হইতে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন (১৮৫৬)। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন এবং তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পান। সে-যুগের সখের নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়াস্থিত বাগানবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হয়।

মধুসূদন ছিলেন প্রধানতঃ কবি, এবং বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার প্রথম দান 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য'। ইহা কবির প্রথম কাব্য হইলেও তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হয় নাটক-রচনার মধ্য দিয়া। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই মধুসূদনের প্রথম উল্লেখ-যোগ্য বাঙলা রচনা; ১৮৫৯ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনাবর্ণনার রীতি বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের সন্ধান দেয়। 'পদ্মাবতী' নাটক কবির দ্বিতীয় রচনা (১৮৬০)। প্রথম নাটকের ন্যায় ইহা পাশ্চাত্ত্য-আদর্শে অনুপ্রাণিত অভিনব সৃষ্টি। যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন এবং সৌন্দর্যসাধন করিয়া মধুসূদন বাঙলা সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ছন্দ প্রথমে তিনি 'পদ্মাবতী' নাটক-এর অংশবিশেষে প্রয়োগ করেন; পরে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের আদ্যোপান্ত রচনা করেন। ইতিপূর্বে বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্য 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে আরও দুইখানি প্রহসন মধুসূদন রচনা করিয়াছিলেন। 'পদ্মাবতী' নাটক-এর পর মধুসূদনের বিয়োগান্ত নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় (১৮৬১)। ইহার পর তিনি আর কোন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই।

প্রথম যৌবন হইতেই মধুসূদনের কেবল একটি কামনা ছিল—খুব বড় কবি হইবার; একটি পিপাসাও ছিল—বিদ্যার্জনের। তিনি বহু ভাষা আয়ত্ত করেন, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিদের কাব্য মূলভাষায় পাঠ করেন; ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বস্তুতঃ, তাঁহার কালে এতবড় বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ইংরেজিকেই ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি নিজের ভাষারূপে বরণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ভাষাতেই কাব্যরচনার অভ্যাস করিতে থাকেন। মাদ্রাজবাসকালে মাতৃভাষার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই আর ছিল না। সেখানে তিনি বাঙলাভাষা একরকম ভুলিতেই বসিয়াছিলেন। "I am losing my Bengali faster than I can mention"—কবির এই মর্মান্তিক স্বীকৃতির পিছনে রহিয়াছে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার প্রচ্ছন্ন অনুরাগ। মাদ্রাজে থাকিতেই ইংরেজি ভাষায় তাঁহার পূর্বোক্ত দুইখানি কাব্য রচিত ও প্রকাশিত হয়, 'Captive Lady' ও 'Visions of the Past'। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ভুল ভাঙে। পিতার মৃত্যু-

সংবাদে এবং বন্ধুদের নির্বন্ধাতিশয্যে তিনি দেশে ফিরিয়া প্রথমে বাঙলা-নাটক ও পরে বাঙলা-কাব্যের উন্নতিসাধনে প্রাণমন সমর্পণ করেন।

নাটক রচনার পরই সহসা তাঁহার কবিপ্রতিভার পূর্ণ-জাগরণ ও অসাধ্যসাধন। তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে 'তিলোত্তমাসম্ভব' নামে একখানি কাব্য রচনা করিলেন, তাহাতে রোমান্টিক কল্পনার দুঃসাহসিকতা আছে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আরও উচ্চাঙ্গের কাব্য-সংগীত ও কাব্য-কল্পনার আবেগে তিনি 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিলেন, এবং অবিলম্বেই বাঙলার শিক্ষিত সমাজে মহাকবি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। ঐ কাব্য বাঙলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনিল। 'মেঘনাদবধ' রচনার প্রায় সমকালে তিনি 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' নামে আরও দুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পর বাঙলাসাহিত্য ত্যাগ করিয়া জীবনের অপর বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন; পরিশেষে ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু উদ্দাম অমিতাচার এবং স্বভাবসুলভ অদূরদর্শিতা ও মহানুভবতার ফলে ঋণজালে জড়িত ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অতিশয় শোচনীয় অবস্থায় তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মধুসূদনের সমগ্র জীবনকাহিনী একটি বিয়োগান্ত নাটকের মত। যেন ঊর্ধ্ব হইতে একটা বহ্নিমান গ্রহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল; সেই দাহ মহতী কামনার দাহ। দেহ তাহাকে ধারণ করিতে পারে নাই। জীবনে নিষ্ফল হইলেও—মধুসূদনের প্রাণ তাঁহার কাব্যের মধ্যে অমর হইয়া আছে, মধুসূদন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার ধ্রুবতারা বাণীর মন্দিরে চিরকাল ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পর তাঁহার হিতৈষিগণের চেষ্টায় মধুসূদন পুলিশ আদালতে মাসিক ১২০৲ টাকা বেতনে দোভাষীর (ইণ্টারপ্রিটার, Interpreter) চাকুরী পাইয়াছিলেন। রাজকার্য, পুস্তক-বিক্রয়ের আয় এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় স্বচ্ছন্দে তাঁহার দিনাতিপাত হইত। মাদ্রাজে থাকিতেই মধুসূদন প্রথমে রেবেকা নাম্নী এক স্কচ বংশীয়া মেয়েকে বিবাহ করেন (১৮৪৮)। এই বিবাহ স্থায়ী হয় নাই। বিবাহের সাত বৎসর পরে পত্নীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। ইহার পর ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের এক অধ্যাপকের কন্যা কুমারী হেনরিয়েটাকে তিনি বিবাহ করেন। ইনিই সাধারণের নিকট মাইকেল-পত্নী হিসাবে পরিচিতা। কলিকাতায় ফিরিবার পর তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মিয়াছিল; এবং এই সময়ে বাঙলাভাষার একজন বিশিষ্ট লেখক বলিয়া মধুসূদনের নাম বাঙলায় বিদ্বৎ-সমাজে সুপরিচিত হয়।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের পর ১৮৬১ (জানুয়ারী) সালে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অমর মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ' দুইখণ্ডে প্রকাশ করেন। বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য গুণগ্রাহী সুপণ্ডিত কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কবিকে প্রকাশ্যে সম্বর্ধিত করেন। বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়া দেশবাসীর দ্বারা সম্বর্ধিত হইবার সৌভাগ্য মধুসূদনের অদৃষ্টেই প্রথম ঘটে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশের অল্পদিন পরেই মধুসূদন গীতিকাব্য 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬১, জুলাই) এবং ১৮৬২ সালে রোমক কবি ওভিদের Heroic Epistles-এর আদর্শে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'বীরাঙ্গনা' প্রকাশ করেন।

আশৈশব মধুসূদনের বিলাত-গমনে বাসনা ছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির ফলে এতদিন তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এইবার স্থির করিলেন ব্যারিষ্টারি পড়িবার জন্য অবিলম্বে ইউরোপ যাত্রা করিবেন। ১৮৬২ সালের ৯ই জুন কবি পরিবারবর্গ ও বন্ধুগণের নিকট বিদায় লইয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। প্রবাসে দারুণ অর্থকষ্টের জন্য কবির জীবনে এক বিষম সংকট দেখা দেয় এবং তাঁহার সেই চরম লাঞ্ছনার দিনে তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হন এবং কবির এই ঘোর দুর্দিনে একমাত্র বিদ্যাসাগরই তাঁহাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। ১৮৬৬ সালের শেষভাগে মধুসূদন লণ্ডনের গ্রেজ্ ইন হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কবির বয়স তখন ৪৩ বৎসর। ইউরোপ প্রবাস কালে তাঁহার বিখ্যাত সৃষ্টি "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" রচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি সাহিত্যের সনেট অনুসরণে তাঁহার এই অবদান ও বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম।

১৮৬৭ সালের গোড়ার দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া মধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে তাঁহার আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ১৮৭০ সালে জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারি ছাড়িয়া মাসিক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টে অনুবাদ-বিভাগের পরীক্ষকের চাকুরী গ্রহণ করেন। দুই বৎসর চাকুরী করিবার পর মধুসূদন পুনরায় ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তাঁহার অর্থচিন্তাই প্রবল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তিনি সাহিত্যক্ষেত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেন নাই। ১৮৭১ সালের শেষভাগে মহাকবি হোমরের 'ইলিয়াড' নামক মহাকাব্যের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাংলায় 'হেক্‌টর-বধ' প্রকাশ করেন।

ইহার পরই কবি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন এবং তাঁহার আয়ুসূর্য ঢলিয়া পড়ে। রোগের যন্ত্রণা, ঋণের যন্ত্রণায় কবির শেষজীবন অশান্তিময় হইয়া উঠে। নিতান্ত অকালেই নির্মম মৃত্যু আসিয়া ১৮৭৩ সালের ২৯শে জুন ভাগ্যতাড়িত কবির বেদনাবিধুর জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিল। "বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে"।

মধুসূদন অতি অল্পকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থ রচনার মধ্যেই ঐ সেবার পরিধি ছিল সীমায়িত। কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এবং ঐ অল্পসংখ্যক গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি মাতৃভাষার যে উন্নতিসাধন করিয়া যান, তাহাতে তাঁহার সহিত এদেশের আর কোনও কবির তুলনা হয় না। তিনি তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া বাঙলাভাষার যে উৎকর্ষসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাঙলাভাষার ইতিহাসে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গৌড়জন চিরকাল আনন্দের সহিত তাঁহার কাব্যসুধা পান করিবে।